দৈনিক সংবাদ · · · 176

24 SEP 1989

তারিখ 24 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়: খবরটা সত্য ছিল না—

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

নেপথ্যে কি ঘটেছে বলা সম্ভব নয়, তবে সংবাদটি নিশ্চয়ই সকলের চোখে পড়েছে। সরকার অস্বীকার করেছেন যে, প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক ছিল। প্রকাশিত সংবাদটি ছিল এরকম: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদোন্নতি (ব্যক্তির) ও পদোন্নয়ন (পদের) অতঃপর আর করা চলবে না। সার্কুলারটি ঠিক কিভাবে এসেছিল, হুবহু কোথাও ছাপা হয়েছে শুনিনি। তবে এর উৎস চ্যান্সেলারের সচিবালয় এবং সহকারী সচিব জনৈক আজিজ আহমদের স্বাক্ষরিত--এটুকু আমরা জানতে পারছি ১৭ই সেপ্টেম্বরের কাগজে প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোট থেকে। প্রেসনোটে বলা হয়েছে, খবরটি একেবারেই ভুয়া। প্রেসিডেন্টের সচিবালয়ে সহকারী সচিবের কোন পদই নেই। তবে আজিজ আহমদ নামধারী কোন ব্যক্তি নেই, এমন কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে কোন স্বার্থান্বেষী মহল সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই এই ভুয়া চিঠি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে এটা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

পুরো ব্যাপারটা রহস্যজনক বই কি। মনে কিন্তু আমাদের কিছু দ্বিধা রয়ে গেল, যদিও স্বস্তির নিঃশ্বাস অনেকেই আমরা ফেলেছি সরকারের এই ব্যাখ্যায়। কিন্তু ব্যাখ্যাটা এত বিলম্বিত লয়ে এল কেন। এটাই প্রশ্ন। কারণ, প্রত্যাশিতভাবেই, সরকারী নিষেধাজ্ঞার খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয় মহল থেকে প্রতিবাদ হয়েছে এবং অন্ততঃ সপ্তাহাধিক সময় ধরে এই প্রতিবাদের খবর বের হচ্ছিল।

প্রতিবাদের মূল বক্তব্য ছিল একটাই: এই নিষেধাজ্ঞা '৭৩ সালে দেয়া বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডার/অ্যাক্টের পরিপন্থী, যে অর্ডার বা অ্যাক্টের সুবাদে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও এদের পদোন্নতির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত। এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপের অর্থই হ'ল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ।

১৭ই সেপ্টেম্বরের সরকারী প্রেসনোটের মর্মার্থ দাঁড়ায়,--এরূপ কোন অভিসন্ধি সরকারের নেই। আমরাও মনে করি, সত্যিই নেই। দেশের প্রায় সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয় এ মুহূর্তে যে সমস্যায় পীড়িত সে হল সেশনজট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি সরকারও উদ্বিগ্ন এই সমস্যার গভীরতায়। এটা সারাদেশের উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেশনজটের কারণ একটি নয়, তবে সম্প্রতি যে কারণটি প্রায় মুখ্য হয়ে পড়েছে সে হল সন্ত্রাস ও সহিংসতা। এই সমস্যার সমাধানও কোন বিশ্ববিদ্যালয় এককভাবে করতে পারছে না বলে সরকারের অর্থাৎ পুলিশ বিভাগের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনার জন্য এখন সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করছে। বাইরে থেকে অন্ততঃ সেই ধারণাই পাওয়া যায়। রাষ্ট্রপতি ও তার মন্ত্রী-সচিব ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা প্রতিমাসেই উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হচ্ছেন। অতীতে কখনো এমন দেখা যায়নি। হয়তো অতীতে কখনো এর দরকার পড়েনি। এ থেকেই একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে: পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক এবং সরকার এ বিষয়ে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল।

এই যখন পরিস্থিতি তখন একেবারে নীলিমা থেকে বজ্রপাতের মতো মনে হয়েছিল নিষেধাজ্ঞার খবরটিকে। স্বীকার করতে বাধা নেই যে, একেবারে আজগবীও মনে হয়নি খবরটা, কারণ আর কিছু নয়, বেশ কিছুদিন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদ সৃষ্টি থেকে শুরু করে নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিস্তর অনিয়মের খবর মুখে মুখে ছড়াচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন খবরই সরকারের অজানা নয়। কারণ মঞ্জুরি কমিশনের খবরদারি ছাড়াও, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাহী পর্ষদে (সিন্ডিকেটে) ও অর্থ কমিটিতে সরকারের মনোনীত সদস্য আছেন। তারাই সরকারের চক্ষুকর্ণের কাজ করে থাকেন। যে বিষয়টি নিয়ে কিছুদিন পর পরই সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছেন, সে হল বহু-সংখ্যক শিক্ষকের উচ্চ শিক্ষা ছুটিতে দীর্ঘকাল বিদেশ-বাস ও তজ্জনিত শূন্যতা। শূন্যপদে নিযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা এত বেশী যে এদের সবাইকে স্থায়ীপদে পেতে হলে বেশ কিছু অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ বিদেশে যারা আছেন তাদের সবাই না হলেও অনেকেই তো শেষ পর্যন্ত ফিরবেন।

কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি ইয়ার-বুকে চোখ বুলালে দেখা যাবে, ছুটি জনিত শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই কোথাও নেই। থাকলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এটা বাংলাদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য। একটু তলিয়ে দেখলে অবশ্য এর কারণও বের করা যায়। দেশে পিএইচ, ডি কর্মকাণ্ড প্রায় অনুপস্থিত। উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য বিদেশে যেতে হয়। বিদেশে যেতে হলে ছুটি নিতে হয়। সরকার বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেন না। পাকিস্তানী আমলে কেন্দ্রীয় সরকার অনেকগুলো বৃত্তি দিচ্ছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম পর্যায়ে সেগুলো চালু ছিল, পরে বন্ধ হয়ে যায়। মুষ্টিমেয় কমনওয়েলথ (ও বর্তমানে ফুল ব্রাইট) বৃত্তির ও ফেলোশিপের বাইরে যা আছে, সে হল যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের স্বার্থে যে ব্যবস্থাটি করে রেখেছে: অ্যাসিষ্ট্যান্টশিপ। টিচিং ও রিসার্চ অ্যাসিষ্ট্যান্টশিপেই আমাদের বেশীরভাগ শিক্ষক বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এটা প্রকৃত প্রস্তাবে ওই সব ধনী দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নবেতনের চাকরি। অ্যাকাডেমিক চীপ লেবার বললেও অত্যুক্তি হয় না--কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের চাপে গবেষণার জন্য সময় বাঁচে। সেজন্য নিচু ক্লাস নেয়া, পরীক্ষার খাতা দেখা জাতীয় দায়িত্ব পালন করে সপ্তাহে ১২ ঘন্টার কাজ তো করতেই হয়, তার প্রস্তুতির জন্যও সময় দিতে হয়---তারপর যে সময় পাওয়া যায়, সেই সময়ে পিএইচ, ডি'র জন্য কাজ করেন এই সহকারীরা। সহকারীরা যে ভাতা বা বেতন পান ওই ভাতায় বা বেতনে ওদেশে কোন কৃতী ছাত্র এ কাজ করবে না। তাই দরিদ্র দেশের মেধাকে ওরা আকর্ষণ করতে পারছে। ৩/৪ বছরের কাজ করতে স্বভাবতঃই লেগে যাচ্ছে ৫/৬/৭ বছর। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও ছুটির নিয়ম-কানুন ক্রমাগত শিথিল করতে হয়েছে বিদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যাতে হাত ছাড়া হয়ে না যান তার নিশ্চয়তা বিধান করতে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়ায় যদি এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তাদের আর দরকার পড়ছে না এই অ্যাকাডেমিক সস্তাশ্রমের, তাহলে তার সরাসরি আঘাত পড়বে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর।

অবশ্য এই আঘাতের ফল ভালও হতে পারে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পিএইচ,ডি কার্যক্রম চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে।

আরও একটি বিষয়ে সরকার মাঝে মাঝে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দুর্বল ডিগ্রীধারী শিক্ষকের নিয়োগ সম্বন্ধে। এ ধরনের নিয়োগ যে অতীতে হয়েছে এবং এখনও মাঝে মাঝে হয়, তা অস্বীকার করা যায় না। উচ্চতর পদে, যোগ্যতর প্রার্থীর দাবীকে পাশ কাটিয়ে দুর্বলতর প্রার্থীর নিয়োগও একেবারে বিরল ঘটনা নয়। একটি পদের বিজ্ঞাপন হল, নিযুক্ত হলেন দুই বা তিন, বা চারজন এমন ঘটনাও ঘটেছে। এগুলোকে কি অনিয়ম বলা যাবে? কারণ এসবই তো হচ্ছে প্রচলিত নিয়মের মধ্যে। নিয়মগুলো তো আমরাই তৈরী করি, প্রচলিত নিয়মকে প্রয়োজনে টেনে লম্বা করি; সরকার মনোনীত সদস্যদের উপস্থিতিতেই করি এবং নির্বাহী পর্ষদ তো এসবই অনুমোদন করে থাকে। অনিয়মটা তাহলে হ'ল কোথায়? যখন বাজেটে টান পড়ে, তখন মঞ্জুরি কমিশন আপত্তি করেন, ভুল হয়ে থাকলে সংশোধনের জন্য চাপ দেন; তাতেও কাজ না হলে বরাদ্দ টাকা ছাড়েন না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য শুধু অস্বস্তিকর নয়, অপমানকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, হচ্ছে তবু এভাবেই চলছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

মঞ্জুরি কমিশনের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনৈতিক শৃংখলা রক্ষা নিশ্চিত করার যে দায়িত্ব দেয়া আছে, সেটা খুবই অপ্রিয় দায়িত্ব। আরও অপ্রিয় হয়েছে এজন্য যে, আমাদের দেশ কোন বিশ্ববিদ্যালয় আপন উদ্যোগে তহবিল সৃষ্টি করতে চায় না, বা পারে না। দেশে এমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি, যারা সাহায্য করবে, গবেষণার অর্থ যোগান দেবে। বাড়তি টাকা যে দেশে একেবারেই নেই, তা নয়, তবে তাদের গতিবিধি অন্যপথে।

ক'দিন আগে একটি ইংরেজী দৈনিকে দেখলাম, একজন অধ্যাপক মঞ্জুরি কমিশনের ব্যর্থতার কথা তুলেছেন এবং তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কমিশন-এ নাকি, একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে এ পর্যন্ত অযোগ্য ব্যক্তিরাই চেয়ারম্যান হয়ে এসেছেন এবং অযোগ্য বলেই এরা তৎপর থেকেছেন মন্ত্রণালয়কে মন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবকে তোষামোদ করে আপন পদে বহাল থাকতে।

কঠিন অভিযোগ, এবং এখানেই শেষ নয়। আক্ষেপ করেছেন বর্তমান ব্যবস্থার বিভাগীয় সভাপতির যে দুর্দশা অর্থাৎ ক্ষমতাহীনতা, সে সম্পর্কে প্রস্তাব করেছেন ডীনদের হাতকে শক্ত করতে এবং ইঙ্গিত করেছেন, বেতনভুক শিক্ষকেরা যদি নিজেরাই নিজেদের জন্য আইন তৈরী করতে পারেন, তাহলে অবস্থা এমনটি হতে বাধ্য।

এটা সত্য যে, কোন প্রতিষ্ঠানের বেতনভুক ব্যক্তিরা তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে না। তাহলে কারা হবে? আমাদের পরিস্থিতিতে। সরকার? জনগণের প্রতিনিধি? সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা? মার্কিন দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের বোর্ড অব গভর্নর্স সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্য বিধানসভা, যারা অর্থ বরাদ্দের মালিক, তারাই প্রকৃত অভিভাবক। আমাদের সমাজে সরকার বা সংসদ বা অনুদান কর্তা--এরা হয় এখনও যথাযথভাবে সম্পৃক্ত হতে পারেননি বা এদের অস্তিত্বই নেই। '৭৩-এর অর্ডার/অ্যাক্টে যেভাবে সিনেট-সিন্ডিকেট গঠিত হয়েছে, তার মধ্যে দেশের বিরাজমান বাস্তবতার স্বীকৃতি আছে। তবে আইন প্রণয়নের, আইন প্রয়োগের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, তাঁরা যদি সেক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে থাকেন, তাহলে আজ না হলেও, কোন একদিন এসত্যকে স্বীকার করতে হবে এবং এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করতে হবে। ইচ্ছার মধ্যে যদি সততা থাকে এবং কর্তৃত্বে যদি বৈধতা থাকে তাহলে কোন কর্তব্যই কঠিন নয়, দুঃসাধ্য নয়। তবে সে পরিস্থিতি যে এ মুহূর্তে নেই এ বিষয়ে অন্ততঃ আমার মনে কোন সন্দেহ নেই।

ভুল সংশোধন

গতকালের উপসম্পাদকীয় নিবন্ধের এক জায়গায় ভুলবশতঃ public squatar ও private affluence ছাপা হয়েছে। শুদ্ধ পাঠ: public squalor ও private affluence।

--ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...24 SEP 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...